'মহানদী' : চলমান জীবনের আখ্যান

শম্পা ভট্টাচার্য (বসু)

নাগরিক জীবনের কপট সুখকে কণ্ঠাভরণ না করে প্রকৃতই মানুষের সন্ধানে যিনি পূর্ণ করেছেন মানস-ঘট; বিশ্বায়নের উন্নত প্রযুক্তির অন্তরালে শায়িত হয়ে আছে যে, ছিন্ন কন্থা, সেখানেই চিত্রিত আছে প্রকৃত ভারতবর্ষের ছবি এবং তাকেই যিনি চিহ্নিত করেন 'জনমদুখিনী মা' বলে— তিনি একালের অন্যতম সাহিত্যকার অনিতা অগ্নিহোত্রী। দীর্ঘ কয়েক বছরের মানসসঞ্চিত সম্পদ তাড়না তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নেয় 'মহানদী' উপন্যাস, তা পড়লে মনে হয়, নদী কেন্দ্রিক সাহিত্য রচনার ধারায় আরও একটি সংযোজন এ উপন্যাসটি। এত অগভীর তক্‌মায় ভূষিত করা যাবে না একে। বরং প্রত্যয় জাগে, বর্তমান সময়ের চলমান ও বহমান মহানদী তীরবর্তী এক দীর্ঘ যাত্রাপথকে তিনি বিন্যস্ত করেছেন ইতিহাসে, আঞ্চলিকতা, মিথ, স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গের বেদনা আর ইতিবাচক কিছু জীবনের পদধ্বনিতে। মহানদীর উৎসমুখ খুঁজতে গিয়ে লেখিকা চলে যান ছত্তিশগড়ে— যেখানে নদীর যাত্রাপথ বিস্তৃত হয়েছে আরো বহুবিধ নদীর সমন্বয়ে, 'মহানদী' উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক চলে যান ইতিহাসের উৎসমুখে আর অরণ্য-পর্বত-নদী-মানুষ সকলকেই আলোকিত করে যে ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন, তাতে প্রকাশ পায় প্রতিদিনের জীবনের কত অসাম্য, বঞ্চনা, কত বিনষ্টি, কত অপ্রাপ্তির হাহাকার। যে কবি তাঁর সাদা পাতায় ফুটিয়ে তোলেন ক'টি আখর— "ঝাঁপ দিয়েছি অগাধ জলে তাই কি নদী / ছোবল মেরে শঙ্খবিষে ভরিয়ে দিলে / অঙ্গ আমার ..."। সেই তিনিই স্বাভাবিকভাবে দায়বদ্ধতা অনুভব করেন প্রসাধনচর্চিত ভারতবর্ষের মুখের অন্তরালে যে কংকালকীর্ণ মুখটি তাকে প্রকাশ করার। বিবিধ চরিত্রের মুখে উঠে আসে এ প্রশ্ন — স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রায় সত্তর বছর পরেও এই অবক্ষয় থেকে মুক্তির কোন চিহ্ন নেই কেন?

কিন্তু হঠাৎই কি 'মহানদী'র আত্মপ্রকাশ? তারও আগে পূর্ব-প্রস্তুতির নিদর্শন তো ছিলই। তাঁর সম্মানজনক প্রশাসনিক পদের কর্মজীবন ও সেই সূত্রে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলকে কৌণিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখার একটা সুযোগ ও বিবিধ মানুষের সংস্পর্শ তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে 'মহুলডিহার দিন', 'সুখবাসী'। সত্যের দাবী মেটানোই তাঁর শিল্পসাধনার অন্যতম শর্ত আর সেই সূত্রেই উদ্ধৃত করা যায় তাঁর বক্তব্য — "আমার গন্তব্যে ঠিক কখন পৌঁছবো জানি না, হয়ত সাঁঝ নামার অনেক পরে। এই মুহূর্তে আমাকে আচ্ছন্ন করে আছে ওই সামনের পথটুকু পেরোনোর নেশা।"[১] সেই পথটুকু পার হতে গিয়ে "দেশের ভিতর দেশ" প্রবন্ধগ্রন্থ প্রাপ্তি ঘটেছে পাঠকের আর কিছু ছোটগল্পে আছে এই সময়ের কথা— অংশুঘাত গল্পের ভিতর ..., অন্তর্ঘাত, ছায়াযুদ্ধ, উচ্চকোটি ..."।[২] অনিতা অগ্নিহোত্রীর গাছ গল্পটিও তার সাক্ষ্য

বহনকারী। 'মহুলডিহার দিন' উপন্যাসে ব্রাহ্মণী নদীর অববাহিকায় মানুষেরই কাহিনী আর "নদী, পর্বতশ্রেণী, অরণ্য এরা আমার লেখার পটভূমি— মানুষের জীবন এদেরই চালচিত্রের সামনে উন্মোচিত হয়"— উক্তিটি 'মহানদী' উপন্যাস পড়তে সাহায্য করে খুব বেশী।

প্রথমেই বলা চলে সমগ্র উপন্যাসে অবিচ্ছিন্ন কোনে ঘটনা আবহ নেই। বারোটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত উপন্যাসটিতে বিধৃত হয়ে আছে তাঁতশিল্পী, কামার, চাষী, বুনাকার, ধীবর, অরণ্যবাসী মানুষের জীবনচিত্র; তাদের বৃত্তিগত কৌলীন্য হারাতে বসার যন্ত্রণা, অন্নসংস্থানের জন্য নিজের রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার বেদনা, বাঁধ নির্মাণ ও উন্নয়নের নামে শত শত গ্রামের ভেসে যাওয়া ও বাস্তুচ্যুত মানুষের বেদনা, তারই মধ্যে ইতিবাচক কিছু মানুষের পদধ্বনি— এ সবের বুনাকার হয়ে তিনি এর বীজ বপন করেন 'অববাহিকা' উপন্যাসে আর তাঁর স্বকথন থেকে অনুভব করা যায় এ উপন্যাস রচনার 'মোমেন্ট' — "কোনও বিশেষ অঞ্চল বা জনপদ নিয়ে এ লেখা নয়। নদী যেমন এগিয়ে চলেছে, বাঁক নিয়েছে, নতুন নতুন মানুষ এসেছে এবং বিচ্ছিন্ন না হলেও, স্বতন্ত্র নানা কাহিনীর মালা ঘিরে রেখেছে নদীকে ... আমি ভৌগোলিক নই, নৃতত্ত্বের গবেষকও, কাজেই মহানদী শেষ পর্যন্ত এক সৃজনশীল লেখকের মর্মকথা হয়েই মূর্ত হয়।" উপন্যাসের পরিচয় নিলেই এ বক্তব্যের সত্যতা প্রকাশ পায়।

উপন্যাসটি বিস্তীর্ণ হয়ে আছে দীর্ঘ বারোটি পরিচ্ছেদ জুড়ে। ধন্তরি জেলা থেকে যাত্রা শুরু করে তার গতিপথের সূচনা আর সে পথের বর্ণনায় উঠে আসে প্রকৃতির মধ্যে বিছানো নানা দৃশ্যপট। প্রথম পর্বেই পরিচিতি ঘটিয়েছেন অরণ্যভূমির — "মহানদীর কুড়ি মাইলের মতো দক্ষিণে আরম্ভ হয়েছে পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য— সব গাছের পাতা একই, সঙ্গে ঝরে যাওয়ায় বনের রঙ পিঙ্গল, ধূসর, কালচে ... এ জঙ্গলে আছে শত সহস্র সেগুন, জঙ্গল কুরু, মহুয়া, সাজা, সেন্‌হা, আমলকী, বয়ড়া, সোয়েনের গাছ।" শহরবাসী পাঠকের কাছে এ এক মায়া অরণ্য আর সেই সূত্রেই দেখা মেলে বৈদ্‌রাজ তুলারাজের, যে সীতানদী সন্নিহিত অঞ্চলটিকে চেনে নিজ কররেখার মত। মানচিত্রে যা ভৌগোলিক রেখায় চিহ্নিত, অনিতা অগ্নিহোত্রীর বর্ণনায় তাই জীবন্ত। মহানদীর উৎসস্থলের ব্রীড়াভূমি, গোঁড় জাতির পরিচয়, যারা সমাজের আলোকবর্তিকা থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন, লেখিকার ভাষায়, 'এরাই অরণ্য মালভূমির আদি সন্তান', নাম-না-জানা পাখিদের পরিচয়, বুনো গন্ধ-মাখা ভেষজ ওষধি সম্পন্ন গাছ এক মায়া পরিবেশ রচনা করে যেন। তুলারামের 'বৈদ্‌রাজ' পরিচিতির বাস্তবতার সঙ্গে মিশে যায় 'বুঢ়ারাজার কখন যে কী ইচ্ছা হয়, কাউকে দেন একমুঠো পোড়া ধান, আবার কারও আঙিনায় উথাল-পাথাল বৃষ্টি এনে দেন।'

এক মন-কেমন-করা কাহিনী অংশ 'মহুল সই'। কুঠেরপালি গ্রাম থেকে জুজুমারা (জুজুমারা) গ্রামের বিস্তার ও ছন্নছাড়া বাস্তুচ্যুত মানুষের কাহিনী। উন্নয়নের নামে মানুষকে বাস্তুচ্যুত করা শুধু হাহাকার বেদনাকেই প্রকটিত করে না, তা কিভাবে চুরমার করে দেয় মানুষের আবেগ, মমতা, স্বপ্ন তা জানতে গেলে কুবের পূজারির হাত ধরা ছাড়া উপায় নেই। কুবেরের অনুষঙ্গেই এসেছে তার মা হিমিরানী ও তার মনের বন্ধু মালতী — 'মহুল সই' এর কথা। ঐতিহাসিকতার আঁচ স্পর্শ করে রেখেছে এই অংশটিকে — যেখানে বাঁধ নির্মাণের জন্য ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৬

পর্যন্ত আন্দোলন করেছিল স্থানীয় মানুষেরা। এরই মধ্যে কুঠেরপালি থেকে নুয়ালবন্ডা গ্রামে মালতীর মতো অনেকের ন্যূনতম ক্ষতিতে বাস্তুচ্যুত হয়ে আসা ঐতিহাসিক সত্য— "এরাই তবে স্বাধীন ভারতের প্রথম বাঁধ প্রকল্পের বাস্তুচ্যুত।" যে জায়গায় পাঠানো হল তার জন্য সরকারের কি কোন দায় ছিল না? প্রশ্ন জাগে, তাদের অবর্ণনীয় কষ্টের কথা শুনে। 'উপরওলাদের তদারকি ঢিলে হয়ে গিয়েছিল' আর তাই তারা হারিয়ে ফেলেছিল তাদের লৌকিক জীবনের আচার, ব্রত পার্বণ সব। বাল্যসখী মালতী কুবের পূজারীর হাত দিয়ে হিমিরানীর উদ্দেশ্যে 'ছোঁয়া' আর 'আদর' ছাড়া আর কিছুই পাঠাতে পারে না। লেখিকার মন-কেমন-করা ভাষায় এই অংশটি বার বার পড়ার সাধ জাগায় মনে।

সুবর্ণপুরে নদীর জল আর তার জালবিস্তার। উপন্যাসটি পড়তে পড়তে খুব স্বচ্ছভাবে ধরা পড়ে ভৌগোলিক রেখাচিত্রের একটি ছায়ারূপ, তেল ও অং নদীর কথা, জানতে পারি সুবর্ণপুর লোকমুখে হয়েছে সোনপুর, এখানকার মহানদীর উদারতা বিন্‌কা ও সন্নিহিত অঞ্চলকে করেছে উর্বর। এ নদী সুবলের কাছে সুন্দরী, মায়াবিনী। নদীর রূপকথনের সঙ্গে আছে এ পর্বে দুটি কাহিনীর ধারা— সত্যেন্দ্র-স্মিতা-সুবলের কাহিনী আর আছে কৈবর্ত গণ্ডারামের জীবন সমাপতনের কাহিনী। সম্বলপুরের বাসিন্দা সত্য স্যারের ছাত্র সুবল সংসারের তেল-নুনের অভাবের মধ্যে আটকে থাকতে চায় না, কিন্তু নিয়মিত অন্ন-সংস্থানের সামর্থ্য নেই তার অথচ সাহিত্য রচনার একটা সুপ্ত প্রতিভা আছে আর তার পাশে রক্ষাকর্তার মতো আছেন অধ্যাপক সত্যেন্দ্র প্রধান— যাঁর স্মিত ব্যক্তিত্ব ও উদার মনোভাব এই পর্বটিকে এক মাধুর্য্য দান করেছে। মহানদীর বিস্তৃতি এত ব্যাপক বলেই হয়তো এখানকার মানুষের চরিত্র উদাররূপে এঁকেছেন লেখিকা। ঝাড়খণ্ডের মেয়ে অধ্যাপিকা স্মিতা কুজুর তার সংগ্রামী সত্তা নিয়ে সমকালীন রাজনীতির ঢেউকে বাস্তবায়িত করেছে। এর সঙ্গে সত্যেন্দ্র স্যারের চেনানো প্রকৃতির বিভিন্ন রঙ, বাতাসের গন্ধ, তার সঙ্গে মিথের মিলন, লঙ্কেশ্বরী দেবীর অস্তিত্ব কৈবর্ত সমাজের মাঝে আঞ্চলিকতাকে স্পষ্ট করেছে— "এ নদীর দেবী কেবল পূজার জন্যই নন, ইনি জীবিকার রক্ষাকর্ত্রী। কেউটদের জীবনধর্ম বাঁচিয়ে তাদের খাইয়ে পরিয়ে রেখেছে এই জল।" এ উপন্যাস আঞ্চলিকতাকে স্পষ্ট করেছে তার জীবন-জীবিকার বিশিষ্টতায়। নীলকণ্ঠ ওরফে গঙ্গারামের জেলে জীবন ও সেই সঙ্গে জালের নিপুণ বর্ণনা পাঠকের সামনে স্পষ্ট করে তোলে তাদের বহমান জীবন— বেঙ্গাজাল, ফেঁকা জাল, জটলাজাল এর উল্লেখে বোঝা যায় লেখিকা কত নিপুণভাবে পরিচিত হয়েছেন এ জীবনের সঙ্গে, সে জীবনের বেদানাও এর মধ্যে নিহিত। অভিশপ্ত হীরাকুঁদ বাঁধ আর তার ওপর নির্মিত ব্রীজ জেলে-জীবনকে সঙ্কটের মুখোমুখি করেছে -"বড়শি গাঁথা মানুষের পালানো কি দেখতে পায় জল?" সামনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ তো নয়ই, নীলকণ্ঠের মতো মাঝিরা ক্ষতিপূরণ পায় যৎসামান্য আর অতীত দিনের মাছ ধরার উৎসবকে স্মরণ করে দিন কাটায়, মানবিক কষ্টে পীড়িত লেখিকা জিজ্ঞাসা করেন— "প্রকৃতি, পাহাড়, নদীজল, মৃত্তিকাজাত ঐশ্বর্য তা কি আর ভূমির সন্তানদের আছে?" ঐতিহাসিক মাহাত্ম্য তেল নদী ও সংলগ্ন অঞ্চলের। রেশমের সুতোয় বান্ধ কাজের নকশা ফুটিয়ে তোলায় দক্ষ যে অঞ্চল, সেখানেই তাঁতশিল্পী পরিণত হয়েছে তাঁত-মজুরে। তাদের জীবনে আছে কী? "মাথার উপর ছাদ, নীচে দুই পা রাখার গর্ত,

তাঁতটি ও নিজের দেহখানি — এছাড়া তাঁতির কাছে আর কিছুই নেই।" রমেশ মেহের-এর মত ব্যবসায়ী এই গুণীদের কদর করে না, বাজার চলতি নকশা শাড়ীর চটক টানে তাকে, দ্বন্দ্ব বাঁধে শিল্পের সঙ্গে বাজার চলতি লাভের। বিদ্যুৎহীনতা, লোভোল্টেজের সমস্যা মেনে নেওয়া ছাড়া আর কীই বা করার আছে? এ সব গ্রামেই ধুঁকছে সমবায় সমিতিগুলি। অনাবৃত সত্য উঠে আসে লেখিকার কলমে— "উৎপাদনের হিসেব, ভরতুকির হিসেব ও তার নয়ছয়ের কাজে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে সমিতির সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট, কিছু মাতব্বর সদস্য এবং বিভাগীয় অফিসার ও কর্মচারীরা।" পরিচিত হয়েছি ধাতুশিল্পী শিতুলিয়াদের জীবনচিত্রের সঙ্গে, দেবদূতের মতো তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন দেবব্রত, তার দল 'পৃথিবী' নিয়ে। সে চেষ্টা করেছে বলাঙ্গির, সোনপুর ও কালাহান্ডি, নুয়াপাড়ার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে যে শিল্পী কারিগর, তাদের সংগঠনে বাঁধার। নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে হেলাভরে তুচ্ছ করে সে দাঁড়ায় এদের পাশে, হতাশও হয়— "ইচ্ছে হয় সংসদীয় গণতন্ত্রের শূন্যতার বৃহদন্ত্রকে টান করে মেলে দেয় খোলা মাঠে— রোদে ঝড়জলের মধ্যে," আঞ্চলিকতা ও ঐতিহাসিকতার মেলবন্ধন তৈরী হয় লেখিকার মুন্সীয়ানায় হারাধন মাস্টারের চরিত্রে ও কন্ধ অধিবাসীদের জীবনচর্চায়। হারাধন মাস্টারের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য ও ইতিহাসের অনুসন্ধানের আন্তরিক সততা নিজের মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের একটি অসামান্য ইতিবৃত্ত। ইতিহাসের আবহ তৈরী হয়ে যায় গঙ্গ জাতির উত্থান, মারাঠা শক্তির অভ্যুদয়, ব্রিটিশ শক্তির উত্থান প্রসঙ্গে।

ফুলবনী জেলার আরাখপাদার অরণ্য, সাংবাদিক রঙ্গর দৃষ্টিতে ভয়ালতার রূপ নেয়। কলামিস্ট সে, সত্যকে তুলে ধরতে ভয় কোথায়? কিন্তু দারিদ্র্যের উলঙ্গ রূপ দেখাতেও অস্বস্তি হয় শিক্ষিত নাগরিকের, আসলে রঙ্গ যে ভাবে উপস্থিত হয় উপন্যাসে, সেখানে তার আধুনিক মনস্কতা, সুমনার সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনের বহির্ভূত একত্র সহবাস, তার শরীরী চাহিদা ও ইচ্ছেমতো দীর্ঘদিনের সঙ্গিনীকে একঘেয়েমির অজুহাতে ওই অরণ্য অঞ্চলে ছেড়ে আসা সবই মানবিক সুখের অন্তরালে থাকা তীব্র অমানবিক চরিত্রকেই উন্মোচিত করে আর অরণ্যের মধ্যে দরিদ্র, হাঘরে মানুষগুলোর কথা শোনার মধ্যে তার যে কৃত্রিমতা, তাও বড় তীব্রভাবে প্রকাশিত; আর রঙ্গর বিবিধ প্রশ্নের জালে 'আত্মগোপন করে থাকা বিচ্ছিন্ন জনপদ' বঞ্চনায় ক্ষোভে হয়ে ওঠে মারমুখী। শিল্পের আগ্রাসন অরণ্যকে ধ্বংস করে — " যে মানুষেরা অরণ্যের কোলে শৈশব থেকে লালিত হয়েছিল, তাদের আশ্রয় হয়ে পড়লো অনিশ্চিত। একের পর এক অরণ্যগ্রাম হয়ে উঠলো এমনই ঠিকানাহীন মানুষের বাসভূমি।" নিরাপত্তাহীন গ্রামীণ জনসমষ্টির মনস্তত্ত্ব বোঝার জন্য এই অংশটি বড় জরুরী; বিশেষতঃ সমকালীন ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অপরিচয়জনিত পরিচিতির স্বাদ পান পাঠক। সুমনা চরিত্রে এই অরণ্যের সুঘ্রাণ, নাগরিক জীবনের সমস্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত মানুষদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব সহমর্মী, সচেতন নারী রূপে তাকে প্রতিষ্ঠা দেয়।

কন্টিলো গ্রামে কাঁসারিদের বসবাস আর কাঁসা ধাতু নির্মাণের 'ডিটেল' তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। যে কল্টিলো ছিল ধাতুশিল্পীদের স্বর্ণভূমি, আজ তা অস্তমিত, "চহিদার সঙ্গে সঙ্গে ভাঁটা পড়েছে ধাতুর যোগানের।" আর কাঁসারি সমবায় সমিতির 'আমলাতান্ত্রিক টানাপোড়েনে'

বন্ধ হয়ে যাওয়া সমকালীন ভারতবর্ষের আদি কৃষ্টির বিলুপ্তিকেই তুলে ধরে।

অনিতা অগ্নিহোত্রী সহজ দক্ষতায় বয়ন করতে পারেন কথনবিশ্ব আর সেই সূত্রেই স্বাভাবিকভাবে উঠে আসে অনার্য জাতির 'নীলমাধব' দেবতার প্রতি অটল ভক্তি, ব্রহ্মপুরাণ বা স্কন্দপুরাণের অনুষঙ্গে জগন্নাথ দেবের কাহিনী। পুরাণ নিয়ে নানা মতভেদ আর কান্টিলো গ্রামের সেই উপকথার সঙ্গেই মিশে যায় বিংশ-একবিংশ শতকের রাজনৈতিক বাতাবরণের জীবন্ত চিত্র — মাওবাদী আন্দোলনের কথা। উগ্রপন্থী এই সংগঠনগুলি কিভাবে জাল বিস্তার করেছে অন্ধ্র ও ছত্তিশগড়ের সীমান্ত অঞ্চল থেকে তারই বিশদ বর্ণনা দিয়ে উপন্যাসটিকে সমকালীন করে তুলেছেন। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আশু কামার ও তার পুত্রের মাওবাদী বিধ্বংসী কাণ্ডে পঙ্গু হয়ে যাওয়ার ঘটনা। এই পঙ্গুত্ব যে কিভাবে মলিন করে দিয়েছে আশুর পরিবারকে, তার বাস্তব চিত্রও প্রকাশিত এখানে। আর এত আঁধারেও তো উজ্জ্বল হয়ে থাকে কিছু আলোকজ্জ্বল মুহূর্ত, যা রূপায়িত হয়েছে আশাবরী চরিত্র সৃজনে। ঘূর্ণিঝড়ে পিতৃমাতৃহীন শিশু ঝঞ্ঝাকে শবর মহিলা শনিচরীর সাহায্যে বড় করে তোলা জীবনের উদার ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করে নিশ্চিত। সেই সঙ্গে মহাবাত্যার আগমনে গ্রাম জীবনের বিধ্বস্ততা, স্বেচ্ছাসেবী নেটওয়ার্কের সহায়তা আর সমস্ত রকম আইনি প্রতিকূলতার বিরোধিতার সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে আশাবরী শনিচরীর দ্বৈত মাতৃসত্তা মহানদীর অগাধ জলবিস্তারকে এগিয়ে নিয়ে যায় সামনের দিকে।

'টানি ও ভরনি' অংশে বান্ধ শিল্পী উপমন্যু ও তার ভাই নিরঞ্জনের পারিবারিক জীবনবৃত্তটি বোধহয় এই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ অংশ। সূচিশিল্প নির্মাণের মত লেখিকা নিপুণভাবে রচনা করে চলেন দুই ভাইয়ের জীবনবোধের পার্থক্য। উপমন্যুর কাছে যা সাধনা, পূজা— নিরঞ্জনের কাছে তা পণ্য। কারণ সংসার চালানোর মত বাস্তব ও কঠিন কাজ করতে হয় নিরঞ্জনকে। দীর্ঘ ছ বছরের সাধনায় উপমন্যু রেশম বস্ত্রের ওপর লিখেছেন জয়দেব এর গীতগোবিন্দ — ছ বছর ধরে নিরামিষ আহার, স্ত্রীসংগ বিচ্ছিন্নতা, বালক সত্যবানের শিশু থেকে বালক হয়ে ওঠা— সাধন শিল্পীর একাগ্রতা স্পষ্ট হয়েছে। পড়তে পড়তে ঘোর লাগে, মোহিনীর একাকীত্ব অথচ স্বামীর কাজের প্রতি দুর্নিবার টান এক রোমাঞ্চের জগৎ নির্মাণ করে। স্বামীর হাত থেকে উপহার পাওয়া নির্মাণ শিল্প, শাড়ী, সযত্নে সঞ্চিত থাকে মোহিনীর গুপ্ত কক্ষে। সেই শাড়ী পরে স্বামীর সঙ্গে মোহিনীর মিলন এক কল্পলোক রচনা করে; এও মনে হয় শিল্পের নমুনা এভাবেই বহমান থেকে যায় পারিবারিক জীবনের ঘেরাটোপে। আর চতুর্থ শতকের প্রসঙ্গ এনে বৌদ্ধ ধর্ম অধুষিত অঞ্চলের শিল্পীদের রেশম সুতোর প্রতি বিমুখতা অহিংসবাদের কথা মনে করায়।

মানিয়াবন্ধের বুনাকার আর তাদের জীবন কিরকম, কিভাবে দিন কাটে তাদের, কি আহার করে তা পড়লে মনে হয়, কতভাবে উপেক্ষিত হয়ে আছে মানুষজন। "ভাত আর ভাত। কখনো সকালে বাসি পান্তা; দিনে রাঁধা ভাত দিনে খেয়ে সাবাড়। সব্জী সবই সেদ্ধ, অথবা কড়াইয়ে তেলের ছিটে দিয়ে খুন্তির ডগ দিয়ে ঠেসে ধরে রান্না। চুনো মাছ বা ক্ষেতের ছটকা চিংড়ি ক্বচিৎ কদাপি — তাও বাটিতে সেদ্ধ করা — তেল কম লাগবে বলে" এই বুনাকাররা

'রঙ্গনী' নামে পরিচিত। তারা সুতোর কাপড়ে রঙ বোনে। বস্ত্রশিল্পীদের প্রতিদিন সংগ্রাম করে বেঁচে থাকা, মূলধনের সংকট জীবনের গান গাইতে দেয় না। কিন্তু হাতের কাছে মজুত থাকে মারণ ওষুধ। কর্ণের জীবনযুদ্ধে পরাজয় এই শ্রেণীর বিপর্যয়কেই চিহ্নিত করে। মানিয়াবন্ধের গ্রামের ছবি চির পরিচিত ভারতবর্ষেরই প্রতিরূপ। পড়তে পড়তে মনের কোণে ভেসে ওঠে খর দ্বিপ্রহরের ছবি; যেখানে পথ কাঁচা, ঝোপের ওপর ধুলোর আস্তরণ, জলের অভাব, কোঠাঘর — সম্পন্নতা কোথায়! হিঞ্জিলিকাট থেকে রঙ্গনীরা আসছিল উপকূল অঞ্চলে, মহাবাত্যার বিপর্যয় তাদের সে জীবনের থিতু হতে দেয় নি। আর মহাজনের হাতছানির থাবা তো আছেই। এ জীবনের কঠোর বাস্তবতা লেখিকাকে আবেগহীন ভাষায় গদ্য নির্মাণে সাহায্য করেছে। বর্ণনায় নেই কোন বাড়তি আবেগ, নির্মেদ কাঠামোয় বর্ণনা করেন অরূপ, এক সরকারী কর্মচারীর অসহায়তা। ইঞ্জিনিয়ার অরূপ মুম্বাইয়ের রঙ্গীন জগৎ ছেড়ে চলে আসে স্বভূমিতে, বলাংগীর সুবর্ণপুরে। "এখানে এসে অরূপ বুঝতে পেরেছে মানুষের দৈন্য কি ভয়াবহ, আর তার চেয়েও কী বীভৎস অন্তঃসার শূন্য রাজনীতির হিংস্র চেহারা। কাজ করবে কি, নানা রাজনৈতিক দলের চাপ সামলাতেই এখানে ফীল্ড অফিসারদের জীবন জেরবার হয়ে যাচ্ছে। খুঁটির জোর না থাকলে এসব অঞ্চলে আসা সম্ভব নয়, টিঁকে থাকাও নয়।" তাই কি অরূপ হয়ে যায় "কালো ও কঠিন"? এই অঞ্চলে সৎ সরকারী অফিসারদের কাজ করার ক্ষমতাও আনন্দের নয় "ক্লাস টু নন গেজেটেড তারা, হাকিম ম্যাজিস্ট্রেট নয় — তাদের মান ও মর্যাদার কানাকড়িও মূল্য নেই — জনতার চোখে তারা পুলিসের দৃষ্টিতে।" সমকালীন রাজনীতির ধরন ধারনও স্পষ্ট ভাষায় বলতে দ্বিধা করেন না লেখিকা — "এখন পার্টির স্টাইল কিছুটা এলিটিস্ট, বিদ্বজ্জনদের সান্নিধ্যে রাঙ্গা, কথার ভঙ্গীতে পরিশীলন এবং আপাদমস্তক স্বচ্ছ জনমুখী প্রশাসনই তাদের লক্ষ্য।" সমকালীন ভারতবর্ষকে তথ্যের আবরণে আবৃত করে লেখিকা সৃষ্টি করে যান একের পর এক সমাচার। বিবেকতাড়িত সরকারী অফিসার অরূপের হতাশা ব্যক্তিবিশেষের যন্ত্রণা নয়; সচেতন, অনুভূতিসম্পন্ন, বিবেকবান মানুষের যন্ত্রণার প্রতিফলন। মহানদীর উপকূল অঞ্চলে কষ্টে জর্জরিত বুনাকারদের জন্য বেশী কিছু করতে না পারা তাকে যন্ত্রণা দেয়। অরূপের চোখ দিয়ে দেখানো ভঙ্গীতে লেখিকা আসলে দেখাতে চান "শিল্প" নামের মহিমময় তাৎপর্য আর যারা "শিল্পী" তাদের প্রতিদিনের ক্লেদাক্ত মলিন জীবনের দিকটি। এ এক অপরিসীম দারিদ্র্য — যে পাত্রে রঙ ফোটায়, সে পাত্রেই ভাত রাঁধে। বর্তমান বাজারে মাসিক এক দেড় হাজার টাকা রোজগারে তাদের জীবনাতিপাত বুকে কাঁপন ধরায়। নুয়াপাটনার বুনাকারদের অবস্থা এত করুণ নয়, কারণ তাদের নির্মিত বস্ত্রের সঙ্গে মিশে থাকে জগন্নাথদেবের অঙ্গবস্ত্রের বর্ণমাহাত্ম্য। প্রথমে ছিল সাদা কালো রঙের বস্ত্র, তারপর নানা ভেষজ রঙ পরবর্তীকালে যুক্ত হয়েছে— "মানুষের যাতে জীবিকা নিশ্চিত হয়; যাতে রঙ ছবি নিয়ে সে আনন্দে থাকতে পারে। তাই দেবতা কত বস্ত্র পরিধান করেন দিনের নানা সময়ে, নানা পর্বে ও উৎসবে।" এ তো তথ্যের সত্য, কিন্তু এরই মধ্যে বিপদের মেঘ ঘনিয়ে আসে কর্ণ নামের বুনাকারের জীবনে। মূলধনের অভাবই যে সবচেয়ে বড় সত্য, আর তাতেই ভেঙ্গে যায় দাম্পত্য, বেঁচে থাকার সংরাগ, আঁধার নেমে আসে জীবনে, কর্ণের আত্মহত্যা এই কঠিন দিকটিকে চিনিয়ে দিতে ভোলে না।

কিন্তু এই তমসাঘন অন্ধকারে বিভ্রান্ত অরূপের পাশে এসে দাঁড়ায় স্ত্রী স্বাতী।

কাহিনীর ক্রমশ মোহানার দিকে যাত্রা আর সম্পন্নতার ছবি কেন্দ্রীভূত হয় পারাদ্বীপ বন্দরকে কেন্দ্র করে। এই বন্দরের স্থান মাহাত্ম্য আছে আর জাপানে এ দেশ থেকে লোহা রপ্তানি ঐতিহাসিক সত্যকে প্রকাশ করে, কুমীর প্রজনন জনিত চাষ কিভাবে ধীবরদের আদি বৃত্তিতে ছোবল বসাতে আসে, তাও মনোরম ভঙ্গীতে প্রকাশ পায় এ উপন্যাসে। জেলে পরিবারের পার্বতীর মতো বহু নারীর অন্ন জোটে না রোজ, ছেলেকে গরম ছ্যাঁকার যন্ত্রণা সহ্য করে ঘরছাড়া থাকতে হয়। নুন্‌কুয়া, কুজংগ, জঙ্গিরা গ্রাম কবেই বা খবরের কাগজের শিরোনামে থাকে? কিন্তু বিপ্লব ঘটে যায় ধীরে ধীরে। এদের কাহিনী বলতে গিয়ে তাই বোধহয় লেখিকা দেখিয়ে দিতে চান, মানুষ তার আদিম জীবিকা ছেড়ে ভিন্ন বৃত্তির দিকে ঝুঁকছে। লুন্‌কুয়া পরিণত হচ্ছে সমৃদ্ধ কুমোর শিল্পীদের গ্রামে। চলিষ্ণুতার পথে ঘটে ক্রমবিবর্তন। সীমান্তর মতো উদ্যোগী মানুষ আছে বলেই 'কারিগর শালা'র আধুনিক পথে যাত্রা ঘাটে। লুন্‌কুয়া মৃৎশিল্পের বাজারে আন্তর্জাতিক মর্যাদা পায়, "আজ তাদের হাতে গড়া পোড়ামাটির ভাস্কর্য এ দেশে গড়ার খরচের পঞ্চাশ থেকে একশো গুণ দামে বিকোচ্ছে।" কেওট পরিবারের পার্বতীর মৃৎশিল্পীদের কাজে যুক্ত হতে চাওয়া, শহরের মায়াজাল থেকে ছিন্ন করে পুত্র গদাধরকে 'মৃত্তিকা' সংস্থায় নিযুক্ত করার বাসনা — মাটির ওপর টানকেই প্রকাশ করে বেশী।

পস্কোবিরোধী আন্দোলন সমসময়ের অভিঘাতকে স্পষ্ট করেছে নিশ্চিত, কিন্তু লেখিকা দেখাতে চান নতুন শিল্পের আঘাতে ক্রমাগত হারিয়ে যাচ্ছে পানের বাজার, খনিজ আকরিক বিনষ্টি, জলের শুদ্ধতা নাশ আর তাতেই সীমান্তের অসন্তোষ। সীমান্ত তার কারিগর শালার পরিধি বিস্তারে উদ্যোগী হলে প্রতিরোধ আসে, দেশীয় খনিজ বিদেশে যাওয়ায় সম্ভাবনায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে মন। 'মৃত্তিকা' ও তার প্রসারে নব জীবনবোধে উত্তীর্ণ হয় শ্যামের মতো সাধারণ একটি ছেলে, যে কামনা করে কোন এক নারীকে। কেমন হবে সেই রমণী? "কেবল শারীরিক সাহচর্যের জন্য একটি নারী — এবং সেই কারণে বিয়ের কথা ভাবতে ইচ্ছে করে না শ্যামের। মন এবং দেহ অন্তরঙ্গ সাহচর্য আর সঙ্গে সুখ — এ দুটোই একসঙ্গে পেতে ইচ্ছে করে তার এবং এখন এই আকাঙ্ক্ষাকে মূল্য দেবার ক্ষমতা রাখে শ্যাম।" বোঝা যায় মোহানা অঞ্চলের বিস্তৃতি প্রসারিত করেছে অঞ্চলিক মানুষদের চাওয়া পাওয়ার ধরনকে। মহানদীর দীর্ঘ পথচলা অবশেষে সমাপ্ত হয় সাগরে এসে। দীর্ঘ বহমানতার ইতিহাস নিয়ে বয়ে চলে মহানদী আর চলার পথে রেখে যায় সম্মিলিত বহুবিধ মানুষের পদসঞ্চার।

'সৃজনশীল লেখকের মর্মকথা' এই উপন্যাস। এক দীর্ঘ অববাহিকা অঞ্চলের চিত্র রচনায় ধরা পড়েছে খণ্ড ভারতবর্ষের এক বাস্তব জীবনলিপি। কোনো সীমাবদ্ধ গণ্ডীতে বেঁধে এর বিচার অসম্ভব। শুধু লক্ষ্যণীয়, যে, উপন্যাসের প্রচলিত ফর্ম কে অনুসরণ না করে এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন অনিতা অগ্নিহোত্রী। বিভিন্ন অঞ্চল ও বিবিধ মানুষের কথা বলতে গিয়ে লেখিকা এক একটি বীজ রোপণ করে গেছেন। উপন্যাসটির মধ্যে বিস্তৃত হয়েছে ছত্তিশগড়ের মালভূমি থেকে সমুদ্রের মোহানা পর্যন্ত বিশাল অঞ্চল। বার বার মনে হয়েছে যেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরসূরী হয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন লেখিকা, 'ডিটেল' বর্ণনায়

স্মরণে এসেছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঞ্চলিকতা, আর যখনই এসেছে মানুষের অনুষঙ্গ, তখনই মুদ্রিত অক্ষরের পেছনে ধরা পড়েছে লেখিকার সংবেদনশীল, মানবিক মুখটি। প্রকৃতির অপার বদান্যতার মাঝে মানুষের হাহাকার, অপ্রাপ্তি, ছিন্নমূল হওয়ার যন্ত্রণাজনিত রেখাচিত্র সমকালীন ভারতবর্ষের অগণতান্ত্রিক রূপটিকেই প্রতিষ্ঠা করে।

সবশেষে উল্লেখ করতে হয় এই উপন্যাসের ভাষা প্রসঙ্গটি। এমন এক মেদুরতা আছে তাঁর লেখনীতে, যে পাঠশেষে মনের ভিতর অনুরণন চলতে থাকে ক্রমাগত আর যেখানে তাঁর শ্লেষ, বেদনা ধ্বনিত, সেখানে ভাষা নির্মেদ, আবেগহীন। 'আমার কথা' অংশে অনিতা অগ্নিহোত্রী বলেছেন 'তবু যেন জেগে ওঠে শিল্পী-চেতনার চিরন্তন অতৃপ্তি — আরো অন্য ভাবে কি লেখা হতে পারত 'মহানদী' উপন্যাস — আরো বৃহৎ, আরো বিস্তৃত? পাঠ শেষে এই সংশয়ের অবসান ঘটে। আখরে নির্মিত অগণিত বর্ণমালাই হয়ে ওঠে এ উপন্যাসের শেষ উত্তর। আর লেখিকার কাছে আমাদের প্রত্যাশা — তাঁর ভাষাতেই বলি — "এখনো লেখার আছে বহুকিছু, আমি যেন/ জীবনের ডালপালা আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে পারি।"

উল্লেখপঞ্জী

১. 'একজন গল্প লেখককে যা পড়তে হয় জানতে হয়', 'কোরক সাহিত্য পত্রিকা', শারদীয় সংখ্যা, ১৪০২, পৃঃ ৯৮

২. 'কথাসোপান' পত্রিকা, ২০১৫